বিজ্ঞাপন।

সাধারণ সমীপে রসসাগর বিবরণের এই নূতন প্রচার নহে। আমরা কবিচরিত গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রসসাগরের প্রথম পরিচয় প্রদান করি, কিন্তু তাহা এত সংক্ষিপ্ত যে তৎপাঠে পাঠকের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না। তৎপরে এডুকেশন গেজেটে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়, তাহাতেও আমরা সাধারণের তৃপ্তিসুখকর কোন বিশেষ পরিচয় পাই নাই। ১২৭৮ সালে শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় "৮ কবি রসসাগরের জীবনচরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদপূরণ" ইত্যভিধেয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থে ৯৬ টী পাদপূরণ আছে, কিন্তু জীবনীসম্বন্ধে অধিক কথা নাই। সংগ্রহকার সে বিষয়ে সম্যক্ দোষী নহেন, তদপেক্ষা অধিক সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত কঠিন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" গ্রন্থে রসসাগরের বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতেও কোন নূতন কথা নাই। গ্রন্থকার কৃষ্ণনগর রাজসংসারে অনেক দিন কর্ম্ম করিতেছেন, এবং রসসাগরের সহিত তিনি বিলক্ষণ পরিচিতও ছিলেন, তথাপি তিনি যখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তখন অন্যের পক্ষে ইহা নিতান্ত দুঃসাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জীবনচরিত সম্বন্ধে কোন নূতন

কথা থাকিবে, এমন আশা করি না। পাদপূরণ দুই চারিটী নূতন থাকিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি কিছুই নূতন না থাকে, তবে এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন কি? একটী প্রয়োজন আছে, তাহা এই;—শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় মহাশয় তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থখানি নিতান্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কথনই পাঠকের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না। তিনি শ্লোকগুলি আদৌ ব্যাখ্যা করিয়া দেন নাই, সে জন্য অধিকাংশ পাঠকেই সে গুলির মর্ম্মগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া রসসাগরের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েন। বাস্তবিক রসসাগরের এমন অনেকগুলি শ্লোক আছে, যে তাহাদের অর্থ, প্রশ্নকর্ত্তার মনের ভাব প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় জ্ঞাত না হইলে ঐ শ্লোকগুলিকে নিতান্ত উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া অনেকের মনে হয়। এইটীই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান কারণ। আমরা সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না, তবে সাধ্যমতে চেষ্টার ক্রটী করি নাই।

আমরা প্রায় দশ বৎসর হইতে রসসাগরের পাদপূরণ সংগ্রহ করিতেছি। শ্যামাধব বাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা এ চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিলাম। পরে জ্ঞানাঙ্কুরে আমাদের মনোমত করিয়া রসসাগর প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম আমাদের পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। সেই মাত্র সাহসে নির্ভর করিয়া আমরা এ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি। এক্ষণে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে পাঠকবর্গের তৃপ্তিসাধন হইলেই সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এ স্থলে ইহা বলা নিতান্ত আবশ্যক যে, পূর্ব্বপ্রচারিত গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে স্থানে স্থানে অনেক পাঠ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে। এরূপ হওয়া কোন মতেই বিচিত্র নহে। কেবল স্মৃতি হইতে যাহার উদ্ধার করিতে হয়, তাহার যে সর্ব্বতোভাবে মিলন কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই পাঠ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা করিবার সময়ে যে পাঠ সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা গিয়াছে।

এই গ্রন্থে যে কয়টী নূতন শ্লোক পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহা কৃষ্ণনগরস্থ অতি প্রাচীন লোকদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কাহারও বা দুই চরণ মাত্র স্মরণ আছে, অপর কোন ব্যক্তির নিকট অবশিষ্ট দুই চরণ পাওয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তির সমগ্র শ্লোকটী স্মরণ আছে, কিন্তু তাহাতে এত দোষ ঘটিয়াছে যে তাহার অর্থ বোধ হয় না, তাহাও সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং বিশেষ বিচার দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা গিয়াছে।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কহিতেছি, এই গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে যে সকল মহাত্মারা আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরঋণে বদ্ধ রহিলাম। ইতি

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

রসসাগর।

এতদ্দেশে কোন কালেই জীবনচরিত লেখার পদ্ধতি ছিল না, সেই জন্যই আমরা ভূতপূর্ব্ব মহোদয়বর্গের জীবনী-সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। অধিক পূর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, শত বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাবলীও ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনীসম্বন্ধেও নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা এবং কবিত্ব বিষয়ে ভারতবর্ষ কোন দেশ অপেক্ষাও ন্যূন ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত বিষয় সমূহের মধ্য হইতে যদি কেহ কখন অলীক ঘটনা পরম্পরার দূরীকরণে সমর্থ হন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিরোভূষণ ছিল। এখন আর ভারতের সে অবস্থা নাই।

আমাদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত নানাবিধ অলীক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ; তন্মধ্য হইতে সারভাগ সঙ্কলন করা যার পর নাই দুঃসাধ্য। যে সকল বিষয় কালের কুটিল ক্রোড়ে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ সমাহার করা বিদ্যোৎসাহী স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা অদ্য যে ব্যক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তিনি অধিক দিনের প্রাচীন লোক নহেন, তথাপি তাঁহার পরিচয় সংগ্রহ করা যার পর নাই কঠিন হইয়া রহিয়াছে। জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বাগোয়ানের সন্নিহিত বাড়েবাঁকা গ্রামে বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইহাঁর বাল্যকাল কিরূপে অতিবাহিত হয় তাহা আমরা বিবিধ অনুসন্ধানেও জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তখন পল্লীগ্রামে বিদ্যা শিক্ষার সম্যক সদুপায় ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বাল্যকালে সংস্কৃত, পারসী, ঊর্দ্দু, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; ইহাতে বোধ হয় তাঁহার পিতা নিতান্ত দীন হীন ছিলেন না, সন্তানের সুশিক্ষার

জন্য তাঁহার যত্নের ক্রুটী হয় নাই। ভাতুড়ি মহাশয় কৃষ্ণনগরে দারপরিগ্রহ করেন, এবং সেই সূত্রেই ভবিষ্যতে উক্ত রাজধানীতে বাস হয়। তাঁহার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অংশ কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই স্থলেই তাঁহার কবিত্ব বিকসিত কুসুমের ন্যায় সকলের মনোহরণ করিয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের রাজসংসার বিদ্যোৎসাহিতার জন্য চিরদিন প্রসিদ্ধ। মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায় অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ির কবিত্বের পরিচয় পাইয়া আপন সভাষদ্ পদে নিযুক্ত করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার কবিত্বরসের আস্বাদনে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে 'রসসাগর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি এই রাজদত্ত উপাধি দ্বারা কৃষ্ণনগর প্রদেশে এত দূর প্রসিদ্ধ ছিলেন, যে অনেকে তাঁহার প্রকৃত নাম অবগত ছিল না। রসসাগরই তাঁহার প্রকৃত নামের ন্যায় হইয়াছিল। তিনি যে এই রাজদত্ত গৌরবাত্মক

উপাধির যথার্থ যোগ্যপাত্র ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

দ্রুত রচনা সম্বন্ধে রসসাগরের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেহ কোন ভাবের এক বা অর্দ্ধ চরণ অথবা চরণের কিয়দংশ বলিলে তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে তাহার পাদ পূরণ করিতেন। তাঁহার আর এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল, তিনি প্রশ্নকারীর ভাব ভঙ্গীতে মনোগত ভাব প্রায়ই অনুভব করিতে পারিতেন। একদা তিনি রাজসভায় চারিচরণে এক সমস্যা পূরণ করিয়া মহারাজের নিকট হইতে চারি টাকা পুরস্কার পাইলেন। রসসাগর চরণে চরণে টাকা দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যদি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করেন, তবে অন্য ভাবে ছয় চরণে এই সমস্যা পূরণ করি।" মহারাজ ইঙ্গিত করিবামাত্র ছয়চরণে পাদপূরণ করিয়া ছয় টাকা পুরস্কার পাইলেন। পুনরায় আট চরণে ঐ সমস্যাপূরণ করিয়া আট টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি এই প্রকারে

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অনায়াসে পাদপূরণ করিতে পারিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র কবিত্বের ব্যত্যয় হইত না।

ইনি যে সকল সমস্যা পূরণ করিতেন, দ্রুত-রচনা নিবন্ধন তাহাতে ছন্দের দোষ দৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু কবিত্বের দোষ দৃষ্ট হইত না। অবকাশ কালে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা সর্ব্বাংশে অতি সুন্দর হইত। যাহা হউক তিনি এই দ্রুত রচনার জন্যই সমধিক বিখ্যাত। ইহা বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, প্রশ্ন করিবামাত্র মুখে মুখে তাহা পূরণ করা সাধারণ ক্ষমতার বিষয় নহে। তিনি ইংলণ্ডনিবাসী সুবিখ্যাত সুরসিক ও উপস্থিত বক্তা থিয়োডর হুক অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না, তবে তাঁহার দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার নাম, ধাম, বংশাবলী এবং তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। ঈদৃশ অসাধারণ

ব্যক্তির আবির্ভাব দেশের অহঙ্কার স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এমন সুরসিক ছিলেন এবং সর্ব্বদা এমন রসভাব সমন্বিত মিষ্ট কথা কহিতেন, যে তাঁহার নিত্য সহচর বন্ধুবর্গ সর্ব্বদা আনন্দে ভাসমান থাকিতেন। অতি দুঃখের সময়েও তাঁহার কথায় হাস্য সম্বরণ হইত না।

রসসাগরের এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান ছিল। পুত্র অকালে বিগত জীবিত হয়। শান্তি-পুরে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতার বিবাহ দেন। সুরধুনীর তীরসন্নিধান-নিবন্ধন-রসসাগর জীবনের শেষভাগ জামাতৃগৃহেই অতিবাহিত করেন। এই স্থানেই ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমরা এস্থলে রসসাগরের রসিকতার কতিপয় উদাহরণ প্রদান করিতেছি।

একদা তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস রাজসংসারের কর্ম্মাধ্যক্ষ রামমোহন মজুন্দারের নিকট কিঞ্চিৎ বেতন প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় পরদিন কলসী উৎসর্গের

নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ-বদনে যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "রসসাগর! আজ নূতন কি?" ভাদুড়ি মহাশয় উত্তর করিলেন "শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, কোন পিতৃক্রিয়া পণ্ড হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এ কারণ আমি কিয়ৎক্ষণ মজুন্দারের নিকট রোদন করিয়া আসিলাম।"

এক সময়ে কোন ভূম্যধিকারীর বাটীতে একটী কর্ম্মোপলক্ষে রাজসভাস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হন। কর্ম্মকর্ত্তা যেখানে বসিয়া বিদায় দক্ষিণা প্রদান করিতেছিলেন, সে গৃহের প্রবেশদ্বার কিছু ক্ষুদ্র। রসসাগর গৃহ প্রবেশ করিতে মস্তকে দ্বার ঠেকিল। সভাস্থ সকলে হাঁসিয়া কহিলেন "আহা, বড় লাগিয়াছে।" রসসাগর কহিলেন "কি করি, ছোট দুয়ারে ত কখনো আসা অভ্যাস নাই!" এই উত্তরে সকলেই অপ্রতিভ হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

কোন সময়ে এক বৈদ্যজাতীয় ভূম্যধিকারীর

ভবনে কলিকাতা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালী-
গায়ক লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস গমন করেন। তিনি
অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। সেই সময়ে ভূম্যধি-
কারী মহাশয় রসসাগরকেও নিমন্ত্রণ করিয়া
লইয়া যান। এই উভয় সুপ্রসিদ্ধ সুরসিকের পর-
স্পর বচন বৈদগ্ধ্য শ্রবণ লালসায় তথায় অনেক
ভদ্রলোকের সমাগম হয়। এই গ্রামের বৈদ্যেরা
ব্রাহ্মণের ন্যায় গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত,
এজন্য তথাকার ব্রাহ্মণ বৈদ্যের মধ্যে আকার
গত কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যাইত না।
নবদ্বীপাধিপতির অধিকার মধ্যে কোন স্থানেই
এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। রসসাগর এই
প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিবার অভি-
প্রায়ে আপন উপবীতে এক কড়া কড়ি বাঁধিয়া
সভায় উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলে ইহার
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর করিলেন
"এ বামুনে পৈতে।" এই কথা শ্রবণমাত্র ব্রাহ্ম-
ণেরা অত্যন্ত হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বৈ-
দ্যেরা যার পর নাই লজ্জিত হইয়া অধোমুখ

হইলেন। রসসাগর অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন, লক্ষ্মীকান্তের একটী চক্ষু ছিল না। রসসাগর সভাস্থ হইলে লক্ষ্মীকান্ত "আসুন আটপুণে ঠাকুর" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। রসসাগর তৎক্ষণাৎ "থাক্‌রে বেটা চারি পুণে" বলিয়া শিষ্টাচারের প্রতিশোধ দিলেন। সভাস্থ সকলে এই উভয় বাক্যের ভাবার্থ জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলে রসসাগর কহিলেন "বিশ্বাস মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন।" লক্ষ্মীকান্ত কহিলেন "এ ঠাকুরটী আটপুণে অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কি না আপনারা তাহার বিচার করিয়া দেখুন।" রসসাগর কহিলেন, "হাঁ আমি আটপুণে, কারণ আমার দুই চোক, কিন্তু এ বেটার চারিপোণে এক চোক।" ইহা শ্রবণমাত্র সকলে হাসিতে লাগিলেন।

এক দিন সন্ধ্যা সময়ে এক সম্প্রদায় রাঢ় অঞ্চলীয় কালীয়দমন যাত্রা কৃষ্ণনগরের আনন্দ-ময়ী তলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। রসসাগর ও তাঁহার কতিপয় সমবয়স্ক আত্মীয় আনন্দময়ী

দর্শনে গমন করিয়া যাত্রা সম্প্রদায়ের সন্ধান পাই-লেন এবং সেই রাত্রে পাড়ার মধ্যে তাহাদের গানের বায়না করিলেন। যাত্রা নিয়মিত সময়ে আরম্ভ হইল, কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ যে ব্যক্তি যশোদা সাজে তাহার পীড়া হইল। আমোদ ভঙ্গ হয় দেখিয়া সকলের অনুরোধে রসসাগর যশোদা সাজিলেন। ব্রজগোপীগণ যশোদার নিকট কহিল "মা যশোদা কৃষ্ণ আমাদের ননী চুরী করে খেয়ে-ছেন।" যশোদা কৃষ্ণকে কহিলেন, "বাপু কৃষ্ণ, চুরি করা মহাপাপ, এমন কর্ম্ম আর কখনো কর না।" দ্বিতীয় বার ব্রজগোপীগণ ঐরূপ অভিযোগ করিল। যশোদা পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন "কৃষ্ণ! কাজ বড় অন্যায় হচ্চে, আমি একবার বারণ করেছি, তথাপি তোমার চৈতন্য হলো না? পুনরায় এরূপ কার্য্য করেছ শ্রবণ করিলে আমি তোমাকে বিলক্ষণ দণ্ড দিব।" ব্রজগোপীগণ তৃতীয় বার আসিয়া অভিযোগ করিল, "মা! কৃষ্ণের জ্বালায় আর আমাদের এখানে বাস করা হয় না। এবার ছিকে ছিড়ে ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী চুরি

করে খেয়েছে।" এই কথা বলিবামাত্র যশোদা-রূপা রসসাগর ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাম হস্তে কৃষ্ণের চূড়া ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে এক খানি জুতা লইয়া কৃষ্ণকে প্রহার করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "বেটাকে ছুই ছুই বার বারণ করেছি, তথাপি চুরি! আজ ননী চুরি, কাল ক্ষীর চুরি, পরশু ঘটী চুরি, এই রকম করে আমাকে ফাঁদাবে মনে করেছ?" প্রহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিতে লাগিল, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রোতৃবর্গ হাঁসিয়া মজলিস্ ফাটাইয়া দিলেন।*

---

* এই গল্পটী সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ কেহ কহেন, রসসাগর যেরূপ পদস্থ লোক ছিলেন, তাহাতে তিনি যে যাত্রার দলে যশোদা সাজিবেন, বিশ্বাস হয় না। অপর কেহ কেহ কহেন, এ ব্যাপারের নায়ক রসসাগর মহাশয়ই বটেন, কিন্তু এ ঘটনাটী কৃষ্ণনগরে সংঘটিত হয় নাই। আমাদের লোকমুখে শুনা কথার উপরই নির্ভর, সুতরাং যিনি যে প্রকার কহেন, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একদা রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী বাবুদের বাটীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছিল। তৎপূর্ব্বে উক্ত যাত্রা আর ও প্রদেশে হয় নাই। রসসাগর প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোক শুনিতে আসিয়াছেন, কিন্তু এত লোক সমারোহ হইয়াছে যে, তাঁহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। কিপ্রকারে প্রবেশ করা যায় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন বাসুদেব সাজিয়া প্রবেশ করিতেছে। রসসাগর তাহাকে ধরিলেন। মুনিগোঁসাই বাসুদেব বলিয়া যতই চীৎকার করে, বাসুদেব তত উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দেয় যে "আমার নড়িবার উপায় নাই, আমাকে এক বামুনে ধরেছে।" বাবুরা চমৎকৃত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে রসসাগর বাসুদেবকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রসসাগর কহিলেল, "এরূপ না করিলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই কৈ?" তাঁহারা তখন আগ্রহাতিশয় সহকারে রসসাগর ও সৎসঙ্গীদিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া উত্তম স্থানে বসাইয়া দিলেন। এরূপ

উপায় অবলম্বন না করিলে গৃহ প্রবেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইত।*

রসসাগরের এরূপ কার্য্য অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না। এক্ষণে তাঁহার কতিপয় সমস্যাপূরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

একদা রাজা গিরিশচন্দ্র অন্তঃপুরে রাণীর সহিত কি কলহ করিয়া রাণীকে বিবিধ অপ্রিয় বচন কহেন, তাহাতে রাণী কহেন 'তুমি স্বামী, ভগবান তোমাকে বলিতে দিয়াছেন, বল বল বল।' মহারাজ ক্রোধ ভরে বাহিরে আসিতেছেন, সম্মুখে রসসাগরকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'বল, বল, বল।' রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

---

* এই বিষয়টী জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা কোন কোন লোকের মুখে শুনিলাম, রসসাগর বাসুদেব ধরেন নাই, তাঁহার সঙ্গী ও নিকট কুটম্ব বৈকুণ্ঠনাথ রায় বাসুদেবকে ধরিয়া টানাটানী করিয়াছিলেন। আমরা এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয় অতি সুরসিক লোক ছিলেন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই পরামর্শ মধ্যে রসসাগর ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দম্পতি কলহে স্বামী হয়ে ক্রোধ মন।
কহেন প্রেয়সী প্রতি অপ্রিয় বচন॥
পতি বাক্যে সতী চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল॥১॥

পাঠক দেখুন, রসসাগর কতদূর ক্ষমতাপন্ন দ্রুত কবি ছিলেন। প্রশ্নকারীর অবস্থা দর্শনে মনের ভাব অনুভব করিতে পারিতেন।

একদা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, 'পায়, পায়, পায় না।' রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন ;—

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎ স্বামী,
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি, আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না॥
দিয়া সকল সম্পদ, এ দেখি ঘোর বিপদ,
বাকী আছে এক পদ, ঋণ শোধ যায় না।
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বৃন্দাবলী দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না॥২॥

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তৎপরে জিজ্ঞাসা করি-

লেন ;—'পায়, পায়, পায়।' রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি,
ছলিবারে বনমালী, হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহে মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইবে বামনের, গায় পায় পায়॥৩॥

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কহেন, ঐ শ্লোকদ্বয় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচিত। আমরা কবিচরিতের উপক্রমণিকা লিখিবার সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত সংকলিত ভারতচন্দ্রের জীবনী দেখিয়া ঐ ভ্রমে পতিত হই। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বিবিধ অনুসন্ধান দ্বারা যে বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেও

তিনি ঐ ভ্রমটীর অনুকরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। এক্ষণে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, যে রসসাগরই উক্ত কবিতাদ্বয়ের প্রণেতা।

মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, 'টুক্ টুক্ টুক্।' রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদ ভরে টলমল রসাতল ক্ষিতি॥
অধৈর্য্য দেখিয়া হর পাতিলেন বুক।
হর হৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥৪॥

মহারাজ রসসাগরের ক্ষমতা বুঝিবার জন্য কহিলেন, 'ঠিক মনের মত হয় নাই।' রসসাগর আবার পূরণ করিলেন ;—

কৈলাশেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধ কালে সুর অরি পেতে দিল বুক।
অসুরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্ ॥৫॥

রাজা তথাপি কহিলেন, মনের মত হয় নাই।

রসসাগর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবার লোক নহেন। আবার তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন ;—

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণ পদে।
রাধা কৃষ্ণ ভিন্ন তার অন্য নাই হৃদে॥
নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কৌতুক।
হৃদপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্ ॥৬॥

তথাপি মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন না, সুতরাং রসসাগর পুনরায় পূরণ করিলেন ;—

পথ মধ্যে দাঁড়াইয়ে পরমা সুন্দরী।
ভুবন মোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুখ।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্ ॥৭॥

রাজা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। এরূপ ক্ষমতা সংসারে অতি বিরল।

সময়ে সময়ে রসসাগরের ভাগ্যে এমন উৎকট প্রশ্ন পড়িত, অনেকেই বিবেচনা করিতেন যে তাহার প্রকৃত উত্তর হওয়া সম্ভব নহে। একদা

প্রশ্ন হইল 'রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।' এই উৎকট প্রশ্ন শুনিয়া সভাস্থ সকলেই ভাবিলেন, হয়ত রসসাগর এইবার অপ্রতিভ হইলেন। রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন ;—

লক্ষ্মীনারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে।
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণকাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল॥৮॥

এখানে লক্ষ্মী শব্দে তণ্ডুল ও নারায়ণ শব্দে জল বুঝিতে হইবে। অন্ন পাকের সময়ে যত জ্বাল পাইতে থাকে, জল ততই তণ্ডুলের মধ্যে প্রবেশ করে। দ্রুত রচনায় এতদূর পর্য্যন্ত ভাব টানিয়া আনা সহজ ক্ষমতার বিষয় নহে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যখন রসসাগর এক দিন স্বহস্তে পাক করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ব্যক্তি উক্ত প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করেন।

কোন সময়ে প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা সাতুরায় রসসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে

'মহাশয় আমি কি একটী প্রশ্ন করিতে পারি ?' রসসাগর আনন্দসহকারে সম্মতি প্রদান করিলে সাতুরায় কহিলেন 'কাট পাথরে বিশেষ কি ?' 'ঐরূপ ভাষাতেই পূরণ করি' রসসাগর এই কথা বলিয়া শ্লোক রচনা করিলেন ;—

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যী।
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি ॥
যখন ঠেক্‌বে পা, ঘুচ্‌বে লা,
লা হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি ? ॥৯॥

বিশ্বামিত্র মুনি রামলক্ষ্মণ সহ মিথিলা গমন সময়ে পথিমধ্যে নদীপার হইবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু মাঝী তাঁহাদিগকে পার করিতে কোন মতেই স্বীকৃত হয় না, কারণ সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হইয়াছে। পাছে নৌকাও মানুষ হয় এই ভয়ে

সে পার করিতে সাহসী নয়। মাঝী এই ভাবে অপভাষায় বিশ্বামিত্র মুনিকে সম্বোধন করিয়া তাহার ভয়ের কথা কহে। প্রশ্নকর্ত্তা সাতুরায় শ্লোক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রসসাগেরর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন।

একদা প্রশ্ন হইল "বড় দুঃখে সুখ।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে ॥
চকা কহে চকী প্রিয়ে এবড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ ॥১০॥

একদা রসসাগর কতিপয় বন্ধু সমেত শান্তি-পুরের ঘাটে স্নান করিতে ছিলেন, এমন সময় ডাকওয়ালা আসিয়া ঘাটে নৌকা নাই দেখিয়া মুকুন্দ নামক ঘাট-মাঝীকে "মুকুন্দ মুকুন্দ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। এমন সময় এক জন কহিলেন "রসসাগর! মুকুন্দমুরারে।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন ;—

পাপের পুলিন্দা বতে ভগ্ন হল পা রে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে ॥
নায়েতে নাহিক মাঝী ডাক রসনা রে!
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে ॥১১॥

বিলক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিলে উপরি উক্ত শ্লোকে দুই ভাব লক্ষিত হইবে। অসাধারণ ক্ষমতা না থাকিলে দ্রুত রচনায় এরূপ কবিতার জন্ম হয় না।

একদা প্রশ্ন হইল "বদর বদর।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর।
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর ॥
শাল পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর।
পাঁথারে পড়িলে তরি বদর বদর ॥১২॥

রামগোবিন্দ নামক একজন শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এক দিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রসসাগরের সহিত সাক্ষাতের পর "লাগে তীর না লাগে তুক্কা" এই প্রশ্ন করিলেন।

তাহাতে রসসাগর গোস্বামী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া নিম্নমত উত্তর করিলেন ;—

গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের ভুক্কা।
গ্রন্থ পাঠ গাঁজা হুক্কা ॥
ধরেন কান লাগান ফুক্কা।
লাগে তীর না লাগে তুক্কা ॥১৩॥

একবার প্রশ্ন হইল "সেই তো বটে এই।" রসসাগর উত্তর করিলেন ;—

তরি বৈ আমার হরি আর কিছুই নেই।
চরণ দুখানি আন আপনি ধুয়ে দেই ॥
নাবিক স্বজাতি পদ পরশিল যেই।
ভবনদীর কাণ্ডারী সেই তো বটে এই ॥১৪॥

নাবিক রামচন্দ্রকে পার করিবার সময়ে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিবার জন্য পদস্পর্শ করিবামাত্র রামচন্দ্রকে ভবনদীর কাণ্ডারী বলিয়া জানিতে পারিল। এস্থলে রসসাগর মহাশয় স্বজাতি শব্দ ব্যবহার করিয়া রসিকতার শেষ করিয়াছেন।

যখন মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায়ের পিতৃব্য দিগ্বিজয়চন্দ্র রায় বারাণসীধামে ছিলেন, তখন রসসাগর এক বার কাশী যান। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে দিগ্বিজয়চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন;—"ছি ছি ছি অমৃত পান করেছিলাম কেনে?" রসসাগর নিম্নলিখিত রসভাব সমন্বিত কবিতা দ্বারা উক্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিলেন।—

জলে কিম্বা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কানে॥
মলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে।
দেবতার আর্ত্তনাদ আত্ম অভিমানে॥
অবিমুক্ত বারাণসী মহিমা কে জানে।
অমর মরিতে চায় আসি কাশী স্থানে॥
মলে হতেম দেবের দেব আনন্দ কাননে।
ছি ছি ছি অমৃত পান করেছিলাম কেনে॥১৫॥

দেবগণ অমৃত পানে অমর হইয়াছেন; কাশীতে মৃত্যু হইলে দেবের দেব মহাদেব হইয়া আনন্দকাননে বিরাজ করিতে পারিতেন, অমর

বলিয়া দেবভাগ্যে তাহা ঘটে না, এই জন্য দেবগণ আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন,—কেন, না বুঝিয়া অমৃত পান করিয়াছিলাম? এরূপ চমৎকারজনক রসভাব সমন্বিত দ্রুতরচনা সংসারে অতি বিরল।

একদা রাজসভায় প্রশ্ন হইল "মক্ষিকার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন।" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

যশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিল জৃম্ভন।
লীলাছলে মুখ মধ্যে দেখান ত্রিভুবন॥
পতঙ্গ পরশে ব্যস্ত মস্তক হেলন।
মক্ষিকার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন॥১৬॥

কপালে মক্ষিকা বসায় কৃষ্ণ মস্তক কাঁপাইলেন, অমনি তাঁহার মুখ মধ্যে প্রতিবিম্বিত ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। এরূপ কূটভাব আনিয়া দ্রুত রচনা মধ্যে সন্নিবেশ করা সাধারণ ক্ষমতার বিষয় নহে।

একবার প্রশ্ন হইল "নিশিতে উদয় পদ্ম

কুমুদিনী দিনে।” সূর্য্যপ্রিয়া কমলিনী নিশাকালে এবং চন্দ্রমহিষী কুমুদিনী দিবাভাগে প্রস্ফুটিত হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব! এরূপ অনৈসর্গিক ঘটনা কেহই কখনো নেত্রগোচর করে নাই। রসসাগর এই উৎকট প্রশ্নের উত্তর করিলেন ;—

জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পলো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে॥
অকালেতে কাল নিশি উভয়ে না জানে।
নিশিতে উদয় পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥১৭॥

অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হইলে অর্জ্জুন শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আগামী কল্য সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবার পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিব, যদি কৃতকার্য্য না হই তবে অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা আত্ম-জীবনের শেষ করিব। জয়দ্রথ বধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কৌশল প্রয়োগ দ্বারা অকালে নিশির উদয় করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহাই

অবলম্বন করিয়া রসসাগর এই কবিতা পূরণ করি-য়াছিলেন।

একদা রসসাগর বেতন প্রার্থনায় রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী রামমোহন মজুন্দারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মজুন্দার অতি সুচতুর লোক ছিলেন; রাজবাটীর অবস্থা তখন অতি মন্দ হইয়াছিল, অতি সুকৌশলে মজুন্দার মহাশয় রাজসংসার চালাইতেছিলেন। সে সময়ে অনে-কের টাকা পাইতে বিলম্ব হইত। ওদিকে প্লৌডিন সাহেব ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইয়া তাহার উপর কর সংস্থাপন করিতে ছিলেন, এজন্যও রাজকোষে বিশেষ টানাটানী পড়িয়াছিল। রস-সাগর মজুন্দার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া টাকা চাহিবামাত্র তিনি বিরক্ত হইয়া বহিলেন "আর মেনে পারিবেন।" রসসাগর উহার এই পাদ পূরণ করিলেন ;—

দাঁড়ী ফেলে শ্রীফেঁদে, শুধু হাঁড়ী পাত বেঁধে,
বচনে রেখেছি ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করিনে।

সবে বলে মজুন্দার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার,
তিরস্কার পুরস্কার, তৃণবোধ করিনে ॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মেলে রজত খণ্ড,
কোন রূপে কর্ম্ম কাণ্ড, ক্রিয়াপণ্ড করিনে।
কোম্পানী কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য উদয়,
প্লৌডিনের পূর্ণ দায়, বাঁচিও নে মরি নে ॥
সকলি দুঃখের পড়া, এ রসসাগরে চড়া,
শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া, কারো ধার ধারিনে।
তিন দিকে তিন তেতম্বা, কিবা হবে অপরম্বা,
কুল দেও জগদম্বা, আর মেনে পারিনে ॥১৮॥

একদা রাজীবলোচন নামা কোন ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া রসসাগরকে কহিয়াছিলেন "ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

আত্মবিস্মৃত হলে রাজীবলোচন।
এ রসসাগরে দেখে ভঙ্গ দশানন ॥
কাটা গেল সেনাপতি দেখা দিল বিধি।
ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি ॥১৯॥

উপরি উক্ত শ্লোকটীর মর্ম্ম এই ;—পূর্ব্বে রাজসংসারভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল ইজারা দেওয়া হইত। কাহাকে কিছু টাকা দিতে হইলে রাজ-কর্ম্মচারিবর্গ ইজারদারের উপর বরাত চিটী কাটি-তেন। ইজারদারেরা পাওনাদারের প্রয়োজন বুঝিয়া ডিস্কোণ্ট বাদ দিয়া বরাতি টাকা দিতেন। রাজীবলোচন একজন ইজারদার, ইনি অতি দরিদ্র-দশা হইতে অতি ধনবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর রসসাগর এক দশ টাকার বরাত চিটী আনিলেন। রাজীবলোচন কহিলেন, "যদি এই দশ টাকার ছয় টাকা বাদ দিয়া চারি টাকা গ্রহণ করেন, তবে এখনি দিতে পারি।" রসসাগর ইহাতে ইতস্তত করায় রাজীবলোচন বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি"—অর্থাৎ রাজা শ্লোক শুনিয়া আমোদ প্রমোদে নিজের তৃপ্তিসাধন করিবেন, কিন্তু টাকা দিবার সময় আমি। ইহাতে রসসাগর ঐ শ্লোক পূরণ করিলেন। আত্মবিস্মৃত হলে রাজীবলোচন অর্থাৎ তোমার অবস্থা কি ছিল, এবং এখন

তুমি কি হইয়াছ। 'ভঙ্গ দশানন' অর্থাৎ দশ টাকা ভঙ্গ হইল। 'কাটা গেল সেনাপতি দেখা দিল বিধি' অর্থাৎ দশাননের মধ্যে সেনাপতি (ষড়াণন) কাটা পড়িলেন, এবং বিধি (চতুর্মুখ) দেখা দিলেন। দশটাকার মধ্যে ছয় টাকা বাদ গেলে চারি টাকা মাত্র থাকিল। রাজীবলোচন এই শ্লোক শ্রবণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দশ টাকাই দিলেন।

একদা এই কূট প্রশ্ন হইল "পিতার বৈমাত্র সে তো আমার বৈমাত্র।" প্রশ্ন যতই কঠিন হউক না কেন, রসসাগরের ক্ষমতার নিকট উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত। তিনি পূরণ করিলেন ;—

তর্পণ কালেতে কুন্তী প্রকাশিল মাত্র।
উচ্চরবে কাঁদে তবে মাদ্রীর দুই পুত্র॥
ষড়যন্ত্রে বধিলাম এমন সুপাত্র।
পিতার বৈমাত্র সে তো আমার বৈমাত্র॥ ২০॥

মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কর্ণ বধের পর এ কথা কুন্তী

পঞ্চ পাণ্ডবের নিকট প্রকাশ করেন। কর্ণ এ সম্পর্কে মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেন। আবার ওদিকে সূর্য্যনন্দন অশ্বিনীকুমার. কর্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেন। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে নকুল সহদেবের জন্ম। সুতরাং কর্ণ একদিকে নকুল সহদেবের বৈমাত্রেয়, অপরদিকে তাঁহাদের পিতারও বৈমাত্রেয়। রসসাগরের ঈদৃশা ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

এক জন প্রশ্ন করিলেন 'গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল।' রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

হেন উপকার আর না করিবে কেহু।
বিরহিণী বল্যেন কল্যাণে থাক রাহু॥
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

প্রশ্নের ভাবার্থ এই যে চন্দ্র গ্রহণ সময়েকোন রমণী নিজ নাসাগ্রস্থিত নোলক দাঁতে কাটিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রসসাগর প্রশ্নকারীর মনোগত অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া সেই রমণীকে বিরহিণী

সাজাইলেন। পূর্ণচন্দ্রের সহিত বিরহকাতরা রমণীর যে সম্বন্ধ, তাহা দারুণ বৈষম্যে পরিপূর্ণ। চন্দ্র দর্শনে বিরহিনী রমণীর মনোবেদনা যার পর নাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই তাঁহার শত্রুগণ মধ্যে চন্দ্রদেব প্রধান বলিয়া পরিগণিত। গ্রহণে রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্রের দারুণ দুর্গতি দর্শনে পুলকিত হইয়া বিরহিনী রাহুকে “কল্যাণে থাক” বলিয়া আশার্ব্বাদ করিলেন। চন্দ্রদেবকে আহার করিয়া পাছে রাহুর মন্দাগ্নি হয়, এজন্য বিরহিনী লবঙ্গভ্রমে নাশাগ্রশোভিত মুক্তাফল ফেলিয়া দিলেন ; ভাবিলেন, তাহা খাইলে সমুদায় পরিপাক হইয়া যাইবে। রসসাগরের ঈদৃশ পাদ পূরণ সমূহ পাঠ করিয়া তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এক জন ডেপুটী কালেক্টর রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “ওরে আমার তুমি।” রসসাগর উত্তর করিলেন ;—

সোণা রূপা পার কল্যে দেশে দিলে গমি।
টাকায় আনন দয়েম কানন জমিদারের জমি॥

দেবতা ব্রাহ্মণে হিংসা লাখেরাজ ভূমি।
ডেপুটী কালেক্টর বাবু ওরে আমার তুমি ॥ ২২ ॥

প্রশ্নকারী মহাশয় এই শ্লোক শ্রবণে যার পর নাই অপ্রতিভ হইলেন।

এক বার প্রশ্ন হইল "গগনমণ্ডলে শিবে ডাকে হোয়া হোয়া।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

শক্তিশেলে মৃয়মাণ, লক্ষ্মণের হতজ্ঞান,
রামাজ্ঞায় হনূমান, গন্ধমাদনে যায়।
ঔষধ সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধরি,
নন্দীগ্রাম পরিহরি, উর্দ্ধপথে ধায় ॥
জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম চরিত গায়,
হৃদয় ভাসিয়ে যায়, নেত্র জলে ধোয়া।
শত্রুঘ্ন দেখ ভেবে, বিধির আশ্চর্য্য কিবে,
গগনমণ্ডলে শিবে, ডাকে হোয়া হোয়া ॥ ২৩ ॥

সময়ান্তরে রসসাগর এই ভাবে আর একটী সমস্যা পূরণ করেন, তাহার প্রশ্ন এই ;—"গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি।"

শক্তিশেলে পড়ে যবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পর্ব্বত লইয়া যায় পবন নন্দন ॥

গমন বেগেতে গিরি কাঁপে থর হরি।
গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি ॥ ২৪ ॥

একদা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রাজা দেখিলেন, সর্ব্বগ্রাস হইল না; আর একটু হইলেই সর্ব্বগ্রাস হইত। রাজা রসসাগরকে কহিলেন, "খেতে খেতে খেলে না।" রসসাগর উত্তর করিলেন;—

খেদে কহে বিরহিনী, মণিহারা যেন ফণী,
অভাগীর পক্ষে হিত, কেহ ত করিলে না।
অবলার ভাগ্য ফলে, পশুপতির কোপানলে,
মদনেরে এককালে দহিয়ে দহিলে না ॥
সেতুবন্ধে নানা গিরি, উপাড়িয়ে বাঁধে বারি,
হনুমান বলবান, মলয়া ভাঙ্গিলে না।
হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে, পূর্ণ শশী মুখে পেয়ে,
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে, খেতে খেতে খেলে না ॥ ২৫ ॥

এরূপ রসভাব সমন্বিত কবিতা পাঠে কাহার হৃদয় না পুলকিত হয়? প্রশ্ন হইল "সেইতো যেতে হলো!" রসসাগর পূরণ করিলেন;—

চন্দ্রাবলী সহ কেলী যদি বাঞ্ছা ছিল।
সঙ্কেত করিতে তোমায় কেবা নিষেধিল॥
সুখের যামিনী তব দুখে পোহাইল।
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে সেইতো যেতে হলে॥ ২৬॥

একদা প্রশ্ন হইল "শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী।" রসসাগর উত্তর করিলেন ;—

শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥ ২৭॥

এক জন প্রশ্ন করিলেন "হায় হায় হায় রে।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

দৈতবনে দৈবদশা, দুর্জ্জয় মুনি দুর্ব্বাসা,
দুর্য্যোধনে পূর্ণ আশা, করিবারে যায় রে।
দ্রৌপদীর দেখি ক্লেশ, ব্যস্ত হয়ে হৃষিকেশ,
স্বহস্তে বাঁধিয়া কেশ, আপনি জাগায় রে॥
উঠ উঠ প্রিয়সখি, পাকস্থালী দেখ দেখি,
মেলিতে না পারি আঁখি, বিষম ক্ষুধায় রে।

পাকস্থালী করে ধরি, ভাসিল নয়ন বারি,
দায়ের উপরে হরি, ঘটাইল দায় রে ॥
নিজ পদ্ম করাঙ্গুলি, তপাসিয়া পাকস্থালী,
তৃপ্তোস্মি জগৎবলি, ভুঞ্জে শ্যাম রায় রে।
অখিল ভুবন তৃপ্ত, উদ্গারে বিস্ময় প্রাপ্ত,
ঋষিগণ ভয়ে ব্যস্ত, পলাইয়ে যায় রে ॥
গদা হস্তে ভীম রায়, বাহুড়িয়া পুনঃ যায়,
পঞ্চ ভাই গুণ গায়, ধরি রাঙ্গা পায় রে।
যে ছিল মনের বক্রী, এ রাঙ্গা চরণে বিক্রী,
কত চক্র জান চক্রী, হায় হায় হায় রে ॥ ২৮ ॥

প্রশ্নকারী রসসাগরের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কহিলেন, "মনের মত হয় নাই।" তখন রসসাগর আবার অন্য ভাবে এইমত পূরণ করিলেন ;—

অক্রুর আসিয়া রথে, লয়ে যায় ব্রজনাথে,
বলরাম তাঁর সাথে, মধু পুরে যায় রে।
কাঁদি গোপীগণ যত, প্রেম ধারা অবিরত,
যমুনা তরঙ্গ মত, নয়নে বহায় রে ॥
শুনি রাণী যশমতী, কাঁদিয়ে লোটায় ক্ষিতি,
বলেন রোহিনী সতী, একি হলো দায় রে।

দুপুরে ডাকাতি করি, প্রাণ ধন প্রাণ হরি,

কে মোর নিলরে হরি, হায় হায় হায় রে ॥ ২৯ ॥

ইহাতেও প্রশ্নকারীর মনস্তুষ্টি হইল না। রসসাগরের পুঁজি কিছুতেই ফুরাইবার নহে। তিনি আবার ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া নিম্ন মত শ্লোক রচনা করিলেন ;—

ব্রজ কুল বধূ বলে, পূর্ব্বজন্ম পুণ্য ফলে,

পেয়েছিনু তপোবলে, মনোমত তায় রে।

এবে মোর মন হরি, শ্রীনন্দ নন্দন হরি,

যান বুঝি মধু পুরি, বধি অবলায় রে ॥

মুখে কুলে দিয়ে কালী, না ভজিতে বনমালী,

রসের কলঙ্ক ডালী, তুলিনু মাথায় রে

আরে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদ সাধি,

দিয়ে নিলি হেন বিধি, হায় হায় হায় রে ॥ ৩০ ॥

ইহাতেও প্রশ্নকর্ত্তা সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া রসসাগর অন্য ভাবে নিম্নের শ্লোক রচনা করিলেন ;—

রাজ্য ত্যজি রঘুপতি, পঞ্চবটী অবস্থিতি,

অনুজে বনেতে রাখি, মৃগপিছে ধায় রে।

ভেকধারী নিশাচর, সীতার ধরিয়া কর,
অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোরা পথে যায় রে ॥
জটায়ু শুনিয়ে নাট, মারে বীর পাক সাট,
রথ সহ রাবণেরে, গিলিবারে যায় রে।
বজ্রবানে কাটে পাখ, পলাইয়া মারে ডাক,
এ সময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে ॥ ৩১ ॥

যখন রসসাগর দেখিলেন ইহাতেও প্রশ্নকারীর আশা মিটিল না, তখন নিম্ন মত চরমা করিলেন ;—

রাহু আসি ঘেরে শশী, চকোর খায় সুধারাশি,
বিপ্রঋষি উপবাসী, ধিক্ বিধাতায় রে।
সুরসিক বিজ্ঞ জন, মান নাহি কদাচন,
অপাত্রে উত্তম দান, একি দেখি দায় রে ॥
হতচ্ছিরে যত মূঢ়, সদা করে হুড়াহুড়,
মিছরী ফেলে কোৎড়া গুড়, গাদ মাত্র খায় রে
আশার সুসার নয়, দশার বিগুণ তায়,
খোঁড়ার পা খালে পড়ে, হায় হায় হায় রে ॥ ৩২ ॥

প্রশ্নকারী আর সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে

পারিলেন না। এই শেষোক্ত শ্লোকে প্রশ্নকারীর উপর একটু শ্লেষ আছে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। এমন লোকের রচনার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে?

এক জন প্রশ্ন করিলেন "যাও যাও যাও হে।" রসসাগরের পূরণ—হিমালয়ের প্রতি মেনকার উক্তি;—

পরশিয়ে রাঙ্গাপায়, কি বলেছিলে উমায়,
স্নেহে লোমাঞ্চিত কায়, ভূমিতে লোটায় হে।
মেনকার হতভাগ্যে, ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে,
পাষাণের নাহি সংজ্ঞে, তাই কি জানাও হে॥
মনস্তাপ খণ্ডি চণ্ডী, মণ্ডপে বসিয়া চণ্ডী,
চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডী, কত নাচ গাও হে।
সম্বৎসর গেল বয়ে, উমা আছে পথ চেয়ে,
আন মাহেশ্বরী মেয়ে, যাও যাও যাও হে॥ ৩৩॥

প্রশ্ন,—"গজের উপরে গজ তদুপরি অশ্ব।" রসসাগর মহাশয় পূরণ করিলেন;—

হুহু হুহু হুহুঙ্কার, পদাঘাতে দেহ কার,
হয় বুঝি ছার খার, রসাতল বিশ্ব।
হি হি হি হি অট্টহাসি, অষ্ট দিকে অষ্ট দাসী,
শিবের হৃদয়ে বসি, না করিল দৃশ্য ॥
কিং কিং কিং কিমাভাসে, অনায়াসে দৈত্যনাশে,
শোণিত সাগরে ভাসে, শিবের সর্ব্বস্ব।
হা হা হা হা হাহাকার, গ্রাস করে চমৎকার,
গজের উপরি গজ, তদুপরি অশ্ব ॥ ৩৪ ॥

এক জন প্রশ্ন করিলেন "সতী বাক্য রক্ষা হেতু বিধি বাক্য নড়ে।" রসসাগর একটী প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া পশ্চাল্লিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন।

রুগ্নপতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে।
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে ॥
ভয়ে সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে।
সতী বাক্য রক্ষা হেতু বিধি বাক্য নড়ে ॥ ৩৫ ॥

উপরি উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য বিশদরূপে বর্ণন করা উচিত বিবেচনায়, এখানে

তাহার অবতারণা করা যাইতেছে। অতি পুরা-কালে এক সতী স্ত্রী বাস করিতেন। তাঁহার পতি কুষ্ঠ রোগে বিকলাঙ্গ হওয়ায়, সতী তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া প্রয়োজন স্থানে লইয়া যাই-তেন। একদা লক্ষহীরা নাম্নী স্বর্গবেশ্যা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত নরপিণ্ডের নয়ন পথবর্ত্তিনী হওয়ায় কুষ্ঠীর চিত্তবৈকল্য জন্মে। লক্ষহীরার সহবাস সুখ লালসায় কুষ্ঠীর মন যার পর নাই ব্যাকুল হয়। সতী, পতির এতাদৃশ চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অবগত হইয়া, তাহাকে স্কন্ধে লইয়া রাত্রিযোগে লক্ষহীরার আবাস উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নগরপ্রান্তে মাণ্ডব্যমুনি শূলোপরি পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে ছিলেন। তিনি বাল্য-কালে কীটপতঙ্গদিগকে খড়িকায় বিদ্ধ করিয়া তৎপরিণামদর্শনে পরম পুলকিত হইতেন, সেই জন্যই পরিণামে তাঁহার শূল দণ্ড হয়। শূলে সংস্থাপিত হইয়াও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। তাহারই নিম্ন পথ অবলম্বনে পতিপরায়ণা সতী, রুগ্ন পতিকে স্কন্ধে লইয়া যাইতে ছিলেন।

মাণ্ডব্য মুনির পদে কুষ্ঠীর মস্তকস্পর্শ হওয়ায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন শূলের যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, "যে দুরাচার আমার ধ্যানের বিঘ্ন করিয়া বিবিধ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাহার মৃত্যু হইবে।" সতী তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য স্থান গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রুগ্ন পতি সহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কহিলেন, "আমি যদি সতী হই—আমি যদি কায়মনোযত্নে পতির সেবা করিয়া থাকি, তবে কার সাধ্য আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা দেয়।" সতীর অনিষ্ট সাধন করা দেবগণেরও সাধ্য নহে। সূর্য্যদেব বিবেচনা করিলেন, আমি উদিত হইলেই সতী বিধবা হইবেন, এবং তাহা হইলেই আমাকে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইতে হইবে। এই ভয়ে তিনি সুমেরুর আড়ে লুক্কাইত হইলেন। সূর্য্যোদয় হইল না,—সতীবাক্য রক্ষার জন্য বিধির নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইল। এই প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া রসসাগর মহাশয় সমস্যা পূরণ করিলেন।

তাঁহার সংগ্রহের ক্রটী ছিল না। প্রশ্ন করিবা-মাত্র ঐ সকল ভাব আহরণ করিয়া সমস্যা পূরণ করা সহজ ক্ষমতার বিষয় নহে।

এক জন প্রশ্ন করিলেন, "ললাটে নূপুর ধ্বনি অপরূপ শুনি।" রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করি-লেন ;—

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দনন্দন।
দুর্জ্জয় মানেতে রাধা মজেছে যখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ।
পীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ॥
শেষে পদ মস্তকেতে নিলেন চক্রপাণী॥
ললাটে নূপুর ধ্বনি অপরূপ শুনি॥ ৩৬॥

একদা কথায় কথায় একজন কহিলেন "নিশি অবসান।" রসসাগর চুপ করিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। পূরণ করিলেন ;—

চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশীবয়ান।
সুখতারা আগমনে শশী ম্রিয়মান॥
লোকেতে দেখিলে হবে মোর অপমান।
গাত্রোত্থান কর নাথ নিশি অবসান॥ ৩৭॥

মহাভারত, রামায়ণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবর্ণিত ঘটনা পরম্পরা এবং দেশ প্রচলিত প্রবাদ বাক্য গুলি সর্ব্বদা রসসাগরের মনে জাগরূক থাকিত। প্রশ্ন পড়িবামাত্র তাহার একটী ঘটনা সূত্রে উত্তর গ্রন্থণ করিতেন, সুতরাং উত্তর মাত্রেরই ভাবশুদ্ধ হইত। দ্রুত কবিদিগের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। একদা প্রশ্ন হইল "ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছু মাত্র ভেদ তায় নাই।" তৎক্ষণাৎ রসসাগর দণ্ডীপর্ব্ব অবলম্বন করিয়া শ্লোক রচনা করিলেন।

সুরপুর শূন্য করি, কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি,
ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
দণ্ডী নৃপ দণ্ডে দণ্ডী, ভাবিয়া সহিত চণ্ডী,
অবনীতে উপনীত হন॥
ঊর্ব্বশীর শাপ খণ্ড, দণ্ডীনৃপতির দণ্ড,
অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাঁই।
ভীম জন্য এত হল, ধরাতল স্বর্গস্থল,
কিছুমাত্র ভেদ তায় নাই॥ ৩৮॥

একদা ঊর্ব্বশী শাপগ্রস্তা হইয়া অশ্বিনীরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। পৃথিবীতে অষ্টবজ্র

একত্র হইলে তাঁহার শাপ বিমোচিত হইবে। দণ্ডী নৃপতি অশ্বিনীকে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইলেন যে দণ্ডীরাজ এক অপূর্ব্ব অশ্বিনী পাইয়াছেন, সে রাত্রিকালে অতি মনোহারিণী রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডীরাজের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ দণ্ডীরাজ সমীপে অশ্বিনী প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। দণ্ডী এই অন্যায় প্রর্থনায় অস্বীকৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নৃপতি প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঐ অশ্বিনী পৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক নৃপতির রাজধানী প্রবেশ পূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কেহই কৃষ্ণের বিপক্ষতা করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে দণ্ডী পাণ্ডবদিগের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; পাণ্ডবেরা ইতস্ততঃ করিতে আরম্ভ করিলে ভীম কহিলেন, বিপন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই আশ্রয় দিতে হইবে। ভীম তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। পাণ্ডবদের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তদুপলক্ষে সমস্ত দেবগণ রণস্থলে

উপস্থিত হইলেন। এই রূপে যমের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ইত্যাদি অষ্ট বজ্র একত্রিত হইবামাত্র উর্ব্বশা শাপ মুক্ত হইলেন।

একদা প্রশ্ন হইল "তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিবাইয়ে।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

কৈকেয়ী বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে।
মনস্তাপে ব্রহ্মশাপে জর্জ্জরিত হয়ে॥
দশরথ অযুত বৎসর আয়ু পেয়ে।
তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিবাইয়ে॥ ৩৯॥

প্রশ্ন "কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক।" রসসাগরের পূরণ।—

লম্পট কপট রোগ, অবলার কর্ম্মভোগ,
নন্দালয়ে কীর্ত্তিযোগ, গোকুল আতঙ্ক।
কেঁদে কন যশোমতি, জটিলা কুটিলা সতী,
আন জল শীঘ্রগতি, উভয়ে নিঃশঙ্ক॥
মায়ে ঝিয়ে একি লাজ, পড়িল কলঙ্ক বাজ,
ক্ষিতিতলে বৈদ্যরাজ, পাতিলেন অঙ্ক।

ব্রজে মাত্র সতী রাই, হরে রাম ঘরে যাই,
কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক ॥ ৪০ ॥

এক জন প্রশ্ন করিলেন, "সেই সীতে অ-সীতে।" রসসাগর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিম্ন লিখিত শ্লোক রচনা করিলেন।

কহেন রাম, হে রাম! কি হারাইলাম সীতে!
কেন বা চাহিলে সীতে সংগ্রামে আসিতে?
সান্ত্বাইলেন হনূমান হাঁসিতে হাঁসিতে।
জান কি জানকীনাথ জনক-জনিতে?
অচৈতন্য না থাকিতে তবে ত জানিতে!
শতস্কন্ধ বধি রণে, করাস্ত্র অসিতে।
সমর-সাগরে নাচে সেই সীতে অসীতে ॥ ৪১ ॥

যখন রামচন্দ্র শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করিতে যান তখন সীতা তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। রাম ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে শতস্কন্ধের শর বর্ষণে অচেতন হইয়া পড়েন। জনকনন্দিনী মহাবীর রামচন্দ্রের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে এবং শতস্কন্ধের গর্ব্বিত বচন শ্রবণে স্বয়ং

অসীতা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শতস্কন্ধকে বধ করিলেন। রাম সংজ্ঞা লাভ করিলেন কিন্তু সীতাকে নিকটে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন সীতাদেবী রণরঙ্গিণী বেশে রণস্থলে নৃত্য করিতেছিলেন। হনূমান রামচন্দ্রের কাতরতা দেখিয়া সমুদায় বিবরণ আমূল বর্ণন করিলেন।

প্রশ্ন ;—" যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে।" রসসাগর উত্তর করিলেন ;—

পুত্রবতী সীতা সতী যান সরোবরে।
ঋষি আসি প্রবেশিল আশ্রম কুটীরে ॥
কুশময় কুমার স্থাপিল শূন্য ঘরে।
জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে ॥
একে কৈল যুগল বাল্মীকি মুনিবরে।
যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে ॥ ৪২ ॥

পুত্রবতী সীতাদেবী স্নান করিতে গমন করিলে বাল্মীকি কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লব তথায় নাই। অনেক অনুসন্ধানে

তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কুশ দ্বারা লবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার জীবন দান করিলেন। সুতরাং কুশের জন্ম সময়ে সীতা কুটীরে উপস্থিত ছিলেন না। ঐ মূর্ত্তি লবের অভেদাকৃতি হইল। তাহারই নাম কুশ। এটী শাস্ত্রীয় কথা নহে, প্রবাদ মাত্র।

কোন সময়ে এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিলেন "আর না আর না।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

শ্রীকৃষ্ণ হলেন যবে শ্রীরাম ধানুকী।
রুক্মিণীরে আজ্ঞা দিলেন হইতে জানকী।
রুক্মিণী কহেন নাথ মনে বড় ঘেন্না।
অভাগীরে সীতে হতে আর না আর না ॥ ৪৩ ॥

একদা দ্বারকা নগরে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তাঁহার আদরে সত্যভামা, সুদর্শন চক্র ও গরুড় এই তিন জনের অতিশয় গর্ব্ব হইয়াছে। গর্ব্বহারী তাহাদের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য এক কৌশল করেন, এবং সেই কৌশলের পরিসমাপ্তি

সময়ে তাঁহাকে রাম রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। রুক্মিণীকে সীতা রূপ ধারণ করিতে আদেশ করিলে দেবী পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া কহেন "আর না।" এই শ্লোকে প্রশ্নকারী ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি না হওয়ায় কবি পুনরায় রচনা করিলেন ; —

পতিত হবার লাগি পরের বাড়ী ধন্না।
পতিত হইয়া কন বৃথা ঘর কন্না ॥
আপন বাটী একাদশী পরে পরের বাটী পারণা।
কলারে ব্রাহ্মণের জন্ম আর না আর না ॥ ৪৪ ॥

রাজা গিরিশ চন্দ্র অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয় ছিলেন। একদা তাঁহার কোন বিশ্বাসী ভৃত্যকে অপর কোন আত্মীয়ের শয়ন কক্ষে রাত্রে গাঁটা দিতে আদেশ করেন। ভৃত্য আদেশ প্রতিপালন করিয়া মহারাজের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে যে যে কথা কহেন, তাহা মহারাজ সমুদায়ই জ্ঞাত হইয়া রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন "দিতে হয় দেয়া নয় দিই কি না দিই।"

রসসাগর রাজার মনোগত ভাব বুঝিয়াও প্রথমে উপর্য্যুপরি চারি ভাবের চারিটী শ্লোক রচনা করিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তখন অতি অশ্লীল ভাবের একটী শ্লোক রচনা করিলেন, এবং তাহাই রাজার মনোগত ভাবের সহিত মিলিল। আমরা ঐ অশ্লীল ভাবের কবিতাটী পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে প্রথম শ্লোক চতুষ্টয় প্রকাশ করিলাম।

প্রথম।

রামকে আনিতে গেল বিশ্বামিত্র মুনি।
শুনি দশরথ রাজা লোটায় ধরণী॥
না দিলে শাপয়ে মুনি এখন করি কি।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দি॥ ৪৬॥

দ্বিতীয়।

শ্রীরাম হবেন রাজা, সীতা হবেন রাণী।
বনেতে যাবেন রাম স্বপনে না জানি॥
রাম সীতে বনে দিয়ে প্রাণে কিসে রই।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥ ৪৬॥

তৃতীয়।

যখন হেমন্ত কন্যা করেছিল দান।
ডাক দিয়া আনিলেন যত এয়োগণ ॥
জয়া বিজয়া আর চন্দ্রমুখী হীরে।
সকলেতে আসিলেন এয়ো করিবারে ॥
চরণে আলতা দিতে নাপিতের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দিই কি না দি ॥ ৪৭ ॥

চতুর্থ।

ভীম বলে কীচকেরে শাস্তি দিতে পারি।
অজ্ঞাত হইবে ব্যক্ত এই ভয় করি ॥
না দিলে ছাড়য়ে প্রাণ পঞ্চালের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দিই না দি ॥ ৪৮ ॥

একদা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, " গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।" রসসাগর পূরণ করিলেন ; —

মহারাজ রাজধানী নগর বাহির।
বারোয়ারি মা ফেটে হলেন চৌচির ॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥ ৪৯ ॥

মহারাজ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে নগর প্রান্তে যাইয়া দেখিলেন, বারোয়ারি প্রতিমা প্রস্তুত হইতেছিল ; প্রখর রৌদ্রতাপে অর্দ্ধপ্রস্তুত মূর্ত্তি গুলি ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এবং সিংহের শরীরস্থ খড় দড়ি গাভিতে টানিয়া ভক্ষণ করিতেছে। রাজার মনে মনে এই ভাবটী জাগরূক ছিল, রসসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাই প্রশ্ন করিলেন, রসসাগর যেন দৈবীশক্তি প্রভাবে রাজার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দিলেন। বাস্তবিক ইহা দৈবী শক্তির পরিচায়ক।

একদা প্রশ্ন হইল "হরিনামে খোজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা থোপ।" রসসাগরের পূরণ ; —

ত্রাস পেয়ে গন্ধকালী বলে হনূমানে।
সাবধান হও বাপু কালনিমার স্থানে॥
অতিথি করিয়ে বেটা ধর্ম্ম কল্যে লোপ।
হরিনামে খোজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা থোপ॥ ৫০॥

প্রশ্ন ; —"জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায় দিয়ে ছাতি।" রসসাগরের পূরণ ; —

. ;খের প্রাণ সদা খান গাঁজা কিম্বা পাতি।
যে নেশাতে কিন্‌তে চান নবাবের হাতী॥
এক টানেতে অন্ধকার দিনে জ্বালান বাতি।
জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি॥ ৫১॥

প্রশ্ন ; — " হাটের নেড়ে হুজুক যায়। " রসসাগরের পূরণ। —

উকীল খোজে মকদ্দমা, কোকিলে বসন্ত গায়।
অগ্রদানী নিত্য গণে, কোন্ দিনে কে গঙ্গা পায়॥
সাধু খোজে পরমার্থ, লম্পট খোজে বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে, হাটের নেড়ে হুজুক যায়॥৫১॥

এক জন প্রশ্ন করিলেন "চোক গেলরে বাবা।" সসাগর দৈত্যগুরু শুক্রচার্য্যের বাক্য দ্বারা ঐ সমস্যা পূরণ করিলেন ; —

মূর্খ ভিন্ন সর্ব্বস্ব খোয়ায় কোন্ জন।
বার বার বলিরাজে করি নিবারণ॥
গুরু বাক্য অবহেলে এমনি বেটা হাবা।
গাড়ুর মধ্যে থেকে আমার চোক্ গেলরে বাবা॥৫৩॥

কোন সময়ে প্রশ্ন হইল "তলব হয়েছে শ্যাম

চাঁদের দরবারে।" রসসাগর তাহার এই উত্তর প্রদান করিলেন ; —

করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর।
পিক আদি তোর নামে ফরিদী বিস্তর ॥
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে।
তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে ॥ ৫৪ ॥

উপস্থিত বক্তার পক্ষে এরূপ ভাবশুদ্ধ কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়না। অনেক গুলি ফরিয়াদী একত্রিত হইয়া শ্যামচাঁদের নিকট শ্রীরাধার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সেই সকল ফরিয়াদীর মধ্যে করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর ও পিক প্রধান। তাহাদের অভিযোগের কারণ এই ; —রাধিকা করির কুম্ভ, হরির মধ্যস্থান, হরিণীর নয়ন, মরালের গমন, সুধাকরের সুধা, পিকের স্বর চুরি করিয়াছেন। দূতী শ্রীমতী রাধিকাকে জানাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তোমার নামে এইরূপ অভিযোগ হওয়ায় তাঁহার দরবারে তোমার তলব হইয়াছে। রসসাগর

মহাশয় যে কীদৃশ অসাধারণ শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না।

এক সময়ে প্রশ্ন হইল, "বাহবা বাহবা বাহবা জী।" রসসাগর এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর রচনা করেন। প্রথমটী কৃষ্ণনগরে বাঙ্গলা ভাষায়, দ্বিতীয়টী গয়াধামে হিন্দী ভাষায়। হিন্দী শ্লোকটী গ্রন্থের শেষ ভাগে প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গলা শ্লোকটী এই;—

রাধা কলঙ্কিনী, ব্রজপুরে ধ্বনি,
জানি বৈদ্যরাজ কহিল কি।
আজ্ঞা শিরে ধরি, করিল শ্রীহরি,
ভানুর ঝি তায় ভানুর ঝি॥
তব কৃপা হরি, এ কুম্ভ ঝাঝরী।
পূরিয়া সে বারি, আনিয়াছি।
বদন তুলিয়ে, চাও হে কালিয়ে,
বাহবা বাহবা বাহবা জী॥ ৫৫॥

এস্থলে "ভানুর ঝি" এই শব্দদ্বয়ে বৃকভানু নন্দিনী রাধিকা এবং সূর্য্যতনয়া যমুনা বুঝাইবে।

প্রশ্ন;—"কোন্ ছার পতঙ্গ?" রসসাগরের পূরণ;—

আপনি বলেন বাণী যাহার বদনে।
হেন কালিদাস হত বেশ্যার ভবনে ॥
মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রম ভীম রণে ভঙ্গ।
এ রসসাগর ভবে কোন্ ছার পতঙ্গ ॥ ৫৬ ॥

প্রশ্ন ;—ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এই মাত্র।" রসসাগর মহাশয়ের পূরণ ;—

বার বার যাতায়াত নিজ কর্ম্ম সূত্র।
পূর্ব্ব কথা নাহি মনে কি নাম কি গোত্র ॥
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র।
ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এই মাত্র ॥ ৫৭ ॥

কোন সময়ে প্রশ্ন হইল "হাট শুদ্ধ এই তো।" আমাদের দ্রুত কবি মহাশয় নিম্ন লিখিত শ্লোকে তাহার উত্তর সমাধান করিলেন।

দেহের গৌরব মন, পরভার্য্যা পর ধন,
বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্কুর নাই তো।
পশু পক্ষী কীটে খাবে, অথবা অনলে দিবে,
দেহ রত্ন কেড়ে লবে, আটকান সেই তো ॥
এ রসসাগর মত্ত, সম্পদ গিরিশ দত্ত,
থাকিলে কিঞ্চিৎ সত্ব, পরিচয় দেই তো।

মন তুমি বড় মন্দ, ত্যজে কালী পাদ পদ্ম,
কাল পাশে হলে বদ্ধ, হাট শুদ্ধ এই তো ॥ ৫৮ ॥

একদা প্রশ্ন হইল "কুস্বপনের গোড়া।" কবির পূরণ ;—

হরি বোল রাধাকৃষ্ণ মুখে এই বুলি।
গলে আর কাঁধে যত অধর্ম্মের ঝুলি ॥
কদাচার অধার্ম্মিক যত বেটা ন্যাড়া।
কাণ্ড জ্ঞান বিবর্জ্জিত কুস্বপনের গোড়া ॥ ৫৯ ॥

কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, "হাটে মামা হারালাম।" এই সময়ে রাণাঘাট নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী নীলকমল পালচৌধুরীর ছাগল মারা মকদ্দমা সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল। উক্ত বাবুর মাতুল এই মকদ্দমায় কারাগারে যান। রস-সাগর এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া সমস্যা পূরণ করিলেন।

ঘরে ঘরে বাধাবাধী কেন লাঠী ধরালাম।
অভাগী খুল্লনার মত বনে ছাগ চরালাম ॥
যে ছিল সঞ্চিত ধন নেড়ের বুক ভরালাম।
নীল কমল বাবু কাঁদে হাটে মামা হারালাম ॥ ৬০ ॥

প্রশ্ন ;—" দণ্ডভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।" রসসাগরের পূরণ ;—

মৃত্যুকালে পাতকী পড়িয়া খাবি খায়।
সন্নিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্ম্মরায় ॥
আকার ইঙ্গিতে ভাষে হেন লয় চিত্তে।
শি-কার, বি-কার, কিম্বা ব্র-কারের দিত্বে ॥
যদি ব্যক্তি করে উক্তি কার শক্তি ধরে।
দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে ॥ ৬১ ॥

শি-কার অর্থাৎ শিব, বি-কার অর্থাৎ বিষ্ণু, ব্র-কার অর্থাৎ ব্রহ্মা ইহাদিগের দ্বিত্ব অর্থাৎ এই কয়টী নাম দুইবার উচ্চারণ করিলে দণ্ডধর দণ্ডভয়ে নমস্কার করিবেক।

প্রশ্ন ;—বন্ধ্যানারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।" রসসাগরের পূরণ ;—

যামিনী কামিনী বন্ধ্যা সুমেরুর ছায়।
উপজিল তম পুত্র অন্ধকার প্রায় ॥
ক্রমে ক্রমে উগরায় ক্রমে ক্ষয় পায়।
বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায় ॥ ৬২ ॥

"বন্ধ্যা নারীর সন্তান" ইহাই নিতান্ত

অসম্ভব, তাহার পরে আবার সেই পুত্র অন্ধ, অথচ চন্দ্র দেখিতে পায় ইহা নিতান্ত উম্মত্ত্ব প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এরূপ উৎকট প্রশ্নের যিনি সদুত্তর দিতে পারেন, তিনি যে অপ্রাকৃত মনুষ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? যামিনীকে বন্ধ্যা কামিনী সাজাইয়া রসসাগর মহাশয় উক্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিয়াছেন।

কোন ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন, হঠাৎ কোন রাজসংসার ভাঙ্গিয়া এককালে বহু ধনসম্পত্তিশালী হইয়া উঠেন। এক সময়ে তিনি অনেক অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া তুলা করেন, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন, রসসাগরও তন্মধ্যে ছিলেন। রসসাগর অতি কুরূপ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিলে কখনই বড় লোক বলিয়া বোধ হইত না। কৃতী দান দিবার সময়ে চিনিতে না পারিয়া অতি সামান্য বোধে যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি রসসাগরকে বিলক্ষণ চিনিতেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, করিলেন কি? ইনি নবদ্বীপাধিপতির প্রধান সভাসদ রসসাগর।" কর্ম্মকর্ত্তা ঈষৎ পরিহাসের সহিত

কহিলেন "ইনিই কি রসসাগর? সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্!" এই পরিহাস বাক্যে রসসাগর কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া যে শ্লোক রচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলেন, তাহাতে কৃতী এককালে লজ্জিত হইয়া অবনত বদন হইলেন।

ধন্যরে বিধাতা তুই যারে যখন মাপাস্।
রাজ্য ভেঙ্গে হাতীর বোঝা গাধার পিঠে চাপাস্॥
তুলো কত্যে মূলো দান বেরিয়ে পলো কাবাস্।
ডল্‌তে ডল্‌তে মাকাটী বেরুলো
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্॥৬৩

প্রশ্ন;—"অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।" রসসাগরের পূরণ;—

হাঁরে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল।
সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল॥
বেতো রোগী কেঁদে বলে কোন্ দিন বা ভাল।
অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল॥ ৬৪॥

একদিন মহারাজ আনন্দময়ী দর্শনে গমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন একজন খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। রাজা রসসাগরকে কহিলেন

"ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পরো।" রসসাগর তৎক্ষণাৎ উপস্থিত ঘটনাসূত্রে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন।

ভক্ত হলেন খৃষ্টান, দেবতা হলেন ঈশু।
সেই ধর্ম্মে রত হলেন যত নর পশু॥
সতী গেলেন অধোগতি স্বর্গে যাবে জেরো।
ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পরো॥ ৬৫॥

এ স্থলে জেরো শব্দে জারজ বুঝাইবে।

প্রশ্ন ;—"ধান ভান্তে মহীপালের গীত।" রসসাগরের পূরণ ;—

অম্বিকা নগরে ভাই চিত্ত চমকিত।
মরা মানুষ জিয়ে এসে করে রাজনীত॥
পরাণে না সহে আর এত বিপরীত।
খেতে শুতে ধান ভান্তে মহীপালের গীত॥ ৬৬॥

জাল প্রতাপ চাঁদ অম্বিকা কালনায় আসিয়া রাজা বলিয়া জাহির হন। এই বিষয়ে পরিহাস করিবার জন্য উপরিউক্ত শ্লোক রচিত হয়।

প্রশ্ন ;—"কি করে তা দেখি" রসসাগরের পূরণ ;—

আশুতোষ দেহি গঙ্গা আশুতোষ হয়ে।
নারায়ণ বলে মরি তব জলে রয়ে॥
আমি হে পাতকী বড় যমে দিয়া ফাঁকি।
যমদূতে বিষ্ণুদূতে কি করে তা দেখি॥ ৬৭॥

প্রশ্ন ;—"পর্ব্বত শিখরে মীন উচ্চ পুচ্ছে নাচে।" রসসাগরের পূরণ ;—

ইন্দ্র হাতে বজ্রাঘাতে কার সাধ্য বাঁচে।
অগাধ সমুদ্র মধ্যে মৈনাক ডুবেছে॥
মহতের ক্ষুদ্র দশা দৈবাৎ ঘটেছে।
পর্ব্বত শিখরে মীন উচ্চ পুচ্ছেনাচে॥ ৬৮॥

প্রশ্ন ;—"প্রাণেস্বরে রে মন্মথ।" রসসাগরের পূরণ ;—

অশোক বনেতে সীতা শোকেতে ব্যাকুল।
ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কুল॥
ফেলরে রামের পাশে শূন্যে আনি রথ।
প্রাণ জুড়াক দেখে প্রাণেশ্বরে রে মন্মথ॥ ৬৯॥

প্রশ্ন ;—"পিতামহের মাতামহ রথের সারথা।" কবির পূরণ ;—

তুমি আমি মামা আর কৃপ অশ্বথামা।
কর্ণ দুঃশাসন নহে অর্জ্জুন উপমা॥
কৌরবের গৌরব পিতামহ রথী।
পিতামহের মাতামহ রথের সারথী॥ ৭০॥

কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে তুমি, আমি, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুঃশ্বাসন, ইহার মধ্যে কেহই অর্জ্জুনের সমতুল্য নহে। কৌরবদিগের এই মাত্র গৌরব যে পিতামহ ভীষ্মদেব তাঁহাদের রথী, কিন্তু সেই ভীষ্মদেবের মাতামহ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনের সারথী। বিষ্ণু পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি সে সম্পর্কে কৃষ্ণ গঙ্গার পিতা, এবং গঙ্গা ভীষ্মদেবের মাতা। রসসাগরের ক্ষমতার পরিমাণ করা যায় না।

একদা প্রশ্ন হইল "এক নড়ীতে সাত সাপ মারে।" রসসাগরের পূরণ ;—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ-মত্ত গ্লানি।
সর্প প্রায় আরও তায় সংসার সাপিনী॥
কাশীবাসী করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ধরে।
মায়া ছাড়িতে এক নড়ীতে সাত সাপ মারে॥ ৭১ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমত্ত, গ্লানি এই ছয়টী সর্প, আর সংসার সর্পিণী। কাশীবাসী মায়া পরিত্যাগ করিতে করঙ্গ, কৌপীন আর দণ্ড ধারণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদমত্ত গ্লানি এবং সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়, নচেৎ সাধুপদ বাচ্য হইতে পারে না। এই জন্য মায়া ছাড়িয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এক নড়ীতে সাত সাপ মারিতে হয়। উপরি উক্ত সমস্যা পূরণটী অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পরিগণিত।

প্রশ্ন। "ইস্ ইস্।" পূরণ ;—

নিমকাষ্ঠে বসি কৃষ্ণ পদ বাড়াইয়ে।
না জানি হানিল বান ব্যাধ পুত্র গিয়ে॥
অভাগে বাণের মুখ তুল্য ছিল বিষ।
পড়িল ত্রৈলক্যনাথ করি ইস্ ইস্॥ ৭২॥

প্রশ্ন ; "ঝাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী।" রসসাগরের পূরণ ;—

ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলা শশি।
জনক জননী কাশী নিবাসী॥

মায়ে না বিউল, বিউল মাসী।
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী ॥ ৭৩ ॥

ষড়াণনের জন্মের পর ভগবতী তাঁহাকে শর-বনে নিক্ষেপ করিয়া যান। চন্দ্রমহিষী (ভগবতীর ভগিনী) কৃত্তিকা দেবী সেই সদ্য প্রসূত সন্তানকে নিজ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। চন্দ্রদেব ধ্যানযোগে সমস্ত জানিতে পারিলেন। এত রসিকতা না থাকিলে রসসাগর নাম হইবে কেন ?

প্রশ্ন ; "যার ধন তার ধন লয় নেপো মারে দৈ।" রসসাগরের পূরণ ;—

আয়ান করিল বিয়ে রাধিকা সুন্দরী।
তাঁরে লয়ে বিহারেন মুকুন্দ মুরারী ॥
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে কৈ !
যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ ॥ ৭৪ ॥

একদা কোন ভদ্রলোক রসসাগর মহাশয়কে কহিলেন, আপনি উপস্থিত থাকিয়া আমার এই হিসাবটী নিকাশ করিয়া দেন। মুহুরিদিগের হিসাবে আমার তত বিশ্বাস নাই। তাহাদের ঠিক ঠিক

করা যায় না। তাহাতে অপর এক জন অমনি বলিয়া উঠেন "ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।" রসসাগর তৎ-ক্ষণাৎ একটী সমস্যা পূরণ করিলেন।

বিধিলিপি নিয়োজিত ন ন্যূন অধিক।
শিববাক্য ত্রৈলোক্যে ন গুরুর অধিক॥
গুরুভক্তি হীন জনে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
এ তিন অন্যথা নহে ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্॥ ৭৫ ॥

একদা প্রশ্ন হইল "এই আছিস্ এই নাই বাপ্‌রে বাপ্।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

এই কতক্ষণ রেখে এলাম দুয়ারে দিয়া ঝাপ।
বারে বারে কৃষ্ণ তুই দিচ্যিস মনস্তাপ॥
ক্রোধ করে মহামুনি পাছে দেন শাপ।
এই আছিস এই নাই বাপরে বাপ॥ ৭৬ ॥

মহর্ষি দুর্ব্বাসা নন্দালয়ে অতিথি হইয়াছেন, নন্দ ও যশোদা যথাবিহিত অতিথি সৎকার জন্য দ্রব্যাদি আহরণ করিলেন। মুনি পাকাদি সমাপন করিয়া ইষ্টদেব উদ্দেশে নিবেদন করিতে-ছেন এমন সময় দেখেন নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। মহামুনি এই

ব্যাপার দেখিয়া যশোদাকে ডাকিলেন, যশোদা কৃষ্ণকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রাখিলেন। মুনি পুনরায় ইষ্টিদেবকে নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলে আবার কৃষ্ণ আসিয়া আহারের উদ্যোগ করিলেন। মুনি পুনরায় যশোদাকে ডাকিলেন। কিন্তু ধ্যান যোগে দেখিলেন কৃষ্ণ ইষ্টদেবতা স্বয়ং ভগবান্। যশোদা কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার সময় উপরি উক্ত কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন; "বাছা বাছা বাছা।" রসসাগরের পূরণ;—

কপ্‌নি মেরে অদ্বৈত দেখালেন পাছা।
অবধৌত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন কাছা॥
গৌরাঙ্গ মুড়ালেন বাব্‌রি চুলের গোছা।
তোরা তিন জনেই বৈরাগী হলি বাছা বাছা বাছা॥৭৭॥

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে পঞ্চকোটের রাজসংসারস্থ এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে আগমন করেন। তিনি তিন চরণে একটী প্রশ্ন

প্রস্তুত করেন, চতুর্থ চরণে তাহার উত্তর বিন্যস্ত হইবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রশ্নের তিন চরণ এই ;—

দ্বিভুজা রমণী তার দশ ভুজ পতি।
পঞ্চমুখ পতি কিন্তু নন পশুপতি॥
অপুত্রক পতি-পিতা অপূর্ব্ব কাহিনী।

রসসাগর ইহার চতুর্থ চরণ পূরণ করিলেন যথা ;—

এ রসসাগরে ভাসে দ্রুপদনন্দিনী ॥৭৮॥

দ্বিভুজারমণী—দ্রৌপদী ; দশভুজ পতি—পঞ্চপতির দশ হাত। পঞ্চমুখ পতি কিন্তু নন পশুপতি—শিব নহেন, পঞ্চপতির পঞ্চ মুখ। অপুত্রক পতি-পিতা—পাণ্ডু অপুত্রক, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব পাণ্ডুর ঔরস পুত্র নহেন।

প্রশ্ন ;—"মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়া।"

পূরণ ;—

সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাসরাজার বাড়ী।
হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্মিনীরে ছাড়ি॥

অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান গড়াগড়ী।
মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী ॥৭৯॥

ভীষ্মের জননী গঙ্গাদেবী সধবা এবং বিমাতা পদ্মিনা বিধবা।

প্রশ্ন ;—"বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা।"

উত্তর—

অনিত্য মানব লীলা করি সম্বরণ।
করিল শান্তনু রাজা স্বর্গ আরোহণ॥
ভাবেন বিস্ময়ে ভীষ্ম মরিলেন পিতা।
বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা ॥৮০॥

প্রশ্ন ;—"পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।"

রসসাগরের পূরণ ;—

অদিতি নন্দন সেই দেব পুরন্দর।
শিবাজ্ঞায় পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদীর বর॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি যে যে কন বৃকোদর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ॥৮১॥

অন্য প্রকার।

তর্পণ কালেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কন।
তোমার অগ্রজ কর্ণ রাধার নন্দন॥

শুনিয়া ধর্ম্মের সুত করেন উত্তর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ॥৮২॥

প্রশ্ন ;—"দেশের হবে কি ?" উত্তর,—

শূদ্রেতে বেদ পড়ে বামন হলো ভেকো।
ছত্রিশ বর্ণ এক হলো তার সাক্ষী হুঁকো ॥
শ্বশুরে পুত্রবধূ হরে বাপে হরে ঝি।
ইহা দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি ॥৮৩॥

বোধ হয় তখনকার কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক রচিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ;—"ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা।" পূরণ ;—

চৈত্রে শিবের আরাধনা।
জিহ্বা ফোঁড়েন ঢেকির মোনা ॥
ছোলা কলা গুড় পানা।
ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা ॥৮৪॥

প্রশ্ন ;—"রাম রাম রাম।" পূরণ ;—

সম্পূর্ণ যুবতী নারী বাটীতে রাখিয়ে।
চলিল তাহার পতি বাণিজ্য লাগিয়ে ॥

মধুমাস মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
নিশিতে বিদেশী জন দেখিল স্বপন ॥
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল।
বাটীতে যাইব বলি মনেতে ভাবিল ॥
তিন দিবসের পথ এক দিনে যাব।
নারী সঙ্গ রসরঙ্গ আজিকে করিব ॥
এত ভাবি তাড়া তাড়ি যেতে নিজ ধাম।
উছট খাইয়া বলে রাম রাম রাম ॥৮৫॥

প্রশ্ন ; "হরগিজ।" পূরণ ;—

সর্ব্বস্ব কালের ঘরে রেখেছি মরগিজ।
আশি লক্ষ বারেও আমার ঘুচ্‌লো না খিরকিজ ॥
মনমত্ত অভাগার সব নষ্টের বীজ।
ওরে এখন কালীপদ ধরলিনে হরগিজ ॥৮৬॥

এই শ্লোকটী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। "হরগিজ" শব্দের অর্থ "কোন মতেই," ইহা বাঙ্গালা শব্দ নহে, পারসীক মূল হইতে উৎপন্ন। রসসাগর মহাশয় যে ভাষায় প্রশ্ন, সেই ভাষায় তাহার পাদ পূরণ করিতেন। এটী যে

তিনি হিন্দি ভাষায় রচনা না করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় করিয়াছেন, তাহাতে কিছু চমৎকৃত হইতে হয়। যাঁহাদের মুখে এই শ্লোক শুনা গিয়াছে, তাঁহারা রসসাগরকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এটী রসসাগরের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। উপরে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহাই যে আমাদের একমাত্র অস্বীকারের কারণ এমত নহে। আরও আমরা একটী বিশেষ কারণ দেখাইতেছি। "মারগিজ" শব্দ ইংরাজী মর্টগেজ শব্দের অপভ্রংশ, ইহার অর্থ বন্ধক দেওয়া। এই মারগিজ শব্দটী কলিকাতায় যে প্রকার প্রচলিত, পল্লীগ্রামে তেমন নহে, এমন কি কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সচরাচর সকলে বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ শব্দ যে এত প্রচলিত থাকিবে, এমন কি শ্লোকের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই জন্যই আমরা রসসাগর মহাশ-

রকে ইহার রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ ন্যায় অন্যায় বিচার করিবেন।

প্রশ্ন "হরি বোল হরি।" রসসাগরের পূরণ ;—

নবীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলে হেলে,
মুনিগণ যজ্ঞস্থলে, রাক্ষসী সংহারি।
পরশি চরণ রেণু, পাষাণী মানবী তনু,
নাবিকেরে দিলা পুনু, স্বর্ণময়ী তরি ॥
জনক রাজার পণ, ভগ্ন শম্ভু শরাসন,
রামসীতা সুমিলন, মিথিলা নগরী।
ত্যজে রাজ্য আধিপত্য, সঙ্গি সহ আনুগত্য,
পালিতে পিতার সত্য, হলে বনচারী ॥
সেতুবন্ধ জলনিধি, সবংশে রাবণ বধি,
বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কাপুরী।
জানকী হেন কি পাপী, জ্বলন্ত অনলে ক্ষেপি,
কোমলাঙ্গ পুনরপি, নিলা দগ্ধ করি ॥
গর্ভবতী সতী সীতা, নাহি যার মাতা পিতা,
বনে দিলা হেন সীতা, কি ধর্ম্ম বিচারি।

এ রসসাগরে উক্তি, এবে তো পাইলা যুক্তি,
যদি বল হবে মুক্তি, হরিবোল হরি ॥৮৭॥

অন্যপ্রকার।

ধন ধান্য জাতি প্রাণ, প্রায় রসাতলে যান,
দেব দ্বিজ অপমান, অবিচার পুরী।
সার্ব্বভৌম নৃপ যিনি, মহা ম্লেচ্ছ কোম্পানী,
কলিকাতা রাজধানী, কলি অবতারী ॥
দেশে ভাগ্য নাহি আর, রাজা প্রজা হাহাকার,
কহিতে শকতি কার, প্রাণে যদি মরি।
এ রসসাগরে স্থল, সাজাইয়া ভূমণ্ডল,
শেষে দিলা দাবানল, হরিবোল হরি ॥৮৮

একদা প্রশ্ন হইল "আর সয় না।" সে সময় রসসাগর নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন।

চাতক পাতকী বড়, করেছে প্রতিজ্ঞা দড়,
শরৎ পর্য্যণ্য ভিন্ন, অন্য জল খায় না।
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মাস,
আশ্বাসে রয়েছে শ্বাস, অন্য পানে চায় না ॥

বিস্তারিয়ে ওষ্ঠাধর, নাহি তাহে ধারাধর,
ধরণী তার মূলাধার, সেও তা যোগায় না।
তাঁহে বিশিষ্ট পাপিষ্ঠ, কুস্থষ্ট তো কুজাপৃষ্ঠ।
নবঘনে অধিষ্ঠিত, তিষ্ঠিবারে দেয় না॥
ঝটিত ঝটিত ঝড়, ঝন ঝন চড় চড়,
গগণেতে গড় গড়, ধড়ে প্রাণ রয় না।
ত্রিদশ মুদ্রার কাত, তিন মাস তনুপাত,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি নাথ, বজ্রাঘাত আর সয় না ॥৮৯॥

চাতক যেমন শরৎ পর্য্যণ্য ভিন্ন অন্য জল খায় না, রসসাগরও তেমন রাজপ্রসাদ ভিন্ন অন্যের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী নহেন। রাজবাটীতে ত্রিশ টাকা তাঁহার পাওনা হইয়াছে, তিন মাস হাঁটা-হাঁটী করিয়া আদায় করিতে পারিতেছেন না। যে মুদীর দোকানে ধার করিয়া খাইয়াছেন, তাহার তাগাদায় অস্থির হইয়াছেন। সে মুদী কুস্থষ্ট, কুব্জ পৃষ্ঠ অর্থাৎ অত্যন্ত কদাকার।

রাজা প্রশ্ন করিলেন, "নিষ্কন্ধ চুম্বন করে রমণীর মুখ।" প্রশ্ন শুনিয়া অনেকেই অবাক হইতে

বর্ষাকালে তার মধ্যে পড়ে বারিধারা ॥
আপ নারায়ণ সহ সংসর্গের পরে।
গর্ভবতী হয় মাতা গোলার উপরে ॥
যথাকালে অঙ্কুরাদি তনয় অমনি।
জননীর গর্ভ হতে প্রসবে জননী ॥৯৩॥

কোন সময়ে রাজসংসারে উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকায় বিষয় বিভবাদি অত্যন্ত অব্যবস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই অবগত আছেন, নবদ্বীপের রাজবংশীয়েরা অদ্যাপি হরধাম, আনন্দধাম, শিবনিবাস প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। হরধামে সে সময়ে রাজা গঙ্গেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন, তিনি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের পিতৃব্য। তিনি তাঁহার নামের সহিত বাজপেয়ী উপাধি ধারণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন, সেইজন্য রাজা তাঁহাকে বাজপেয়ী খুড়া বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, তিনি ঐ সময়ে নবদ্বীপাধিপতির সংসারে কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার মনের ভাব যে এসময়ে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া যে সকল ভাল ভাল দ্রব্যাদি তখনও অবশিষ্ট আছে, লইয়া

প্রস্থান করেন। বাস্তবিক কিছুদিনের মধ্যে তাহাই করিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রসসাগর নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক রচনা করেন। যথা;—

কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য।
ছাদ ফুঁড়ে লয়ে যায় ওমরাও দ্রব্য॥
পাতসাই জিনিষ যত ছিল উপজীব্য।
অধনেন ধনং প্রাপ্ত হায়রে পিতৃব্য॥৯৪॥
নবদ্বীপের অধিপতি নৃপতির চূড়া।
কত ইন্দ্র চন্দ্র এই দরজায় খেয়ে গিয়েছেন হুড়া॥
সকল নিলে লুটে পুটে রাখ্‌লেনা এক গুঁড়া।
না বিইয়ে কানাইয়ের মা বাজপেয়ী খুড়া॥ ৯৫॥

বাজপেয়ী যজ্ঞ না করিয়া বাজপেয়ী উপাধি ধারণ করাতেই "না বিইয়ে কানাইয়ের মা" বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

একদা প্রশ্ন হইল "আসল ঘরে মুষল নাই ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া।" রসসাগর পূরণ করিলেন;

কলিকাতার লম্পট যত ফিরে গলি গলি।
দেড়টাকার একধূতি পরে খায় এক খিলি॥

হাতে আছে বাঁদন কুল আড়নয়নে চাওয়া।
আসল ঘরে মুষল নাই ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া ॥৯৬॥

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, রসসাগর একবার রাজীব লোচন সরকার নামক রাজসংসারের একজন ইজারদারের হাতে পড়িয়াছিলেন। মুন্সী গোলাম মোস্তফাও একজন ইজারদার ছিলেন, তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর ছিল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রসসাগর নিম্নের লিখিত শ্লোকটী রচনা করেন।

সকল বাণিজ্য হতে ইজারদারী তোফা।
দয়া ধর্ম্ম চক্ষুলজ্জা ইস্তফা তিন দফা ॥
এ রসসাগরে জানেন অনেক চৌগোঁফা।
মনুষ্যত্ব দেখি মুন্সী গোলাম মোস্তফা ॥৯৭॥

নিম্নে আমরা রসসাগরের কয়েকটী শ্লোক দিতেছি কিন্তু সেগুলির ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নাই। তবে তাহার কোন কোনটী যে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আস্তে আজ্ঞা হোক।

পেটে খেলে পিটে সয় গোবর্দ্ধন কি লোক।
গোবৎস লয়ে গোপ নিরুদ্বেগে রোক ॥
কাছের মানুষ চিন্তে নার সর্ব্বাঙ্গে চোক।
মতিভ্রম পরিশ্রম আস্তে আজ্ঞে হোক ॥৯৮॥

রহ রহ রহ।

আর কেন বাক্যবাণে দহ দহ দহ।
শ্যাম কলঙ্কিণী বাণী কহ কহ কহ ॥
মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ।
রমণে রমণ করে, রহ রহ রহ ॥৯৯॥

স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ব্ভে যায়।

পুত্রের পরম ইচ্ছা পিতা হয় অতি।
শাশুড়ির সাধ মনে জামতারে পতি ॥
পুত্রবধূর পরম ইচ্ছা শ্বশুর লাগুক গায়।
স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ব্ভে যায় ॥১০০॥

হায় হায় হায়।

পুত্রের বাসনা মনে পিতা হউক অতি।
শাশুড়ীর বাসনা মনে জামাই হউক পতি ॥

বধূর বাসনা মনে শ্বশুর লাগুক গায়।

একি বড় আশ্চর্য্য কথা হায় হায় হায় ॥১০১॥

ওরে সর্ব্বনেশে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ সাঙ্গ করে এসে।

কামার ডিঙ্গীর খালের ধারে কাল রয়েছে বসে ॥

মন্‌তো ভুল্লি গুপ্তপল্লী তুচ্ছ কল্যি হেঁসে।

তোরে যা বলেছি তাই করেছিস্ ওরে সর্ব্বনেশে ॥১০২॥

নিম্নের শ্লোকটীতে সুন্দর অর্থসঙ্গতি হয় না বলিয়া আমরা উহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করি নাই।

সার্থক শিবের সিদ্ধি কহে সিদ্ধগণে।

একি রূপ অপরূপ তারক ভুবনে ॥

ছয়ঋতু চন্দ্র সূর্য্য একই উদ্যানে।

নিশিতে উদয় পদ্ম কুমুদিনী দিনে ॥১০৩॥

কৃষ্ণনগরের প্রাচীন লোকমুখে শুনিতে পাই, রসসাগর অনেক হিন্দীশ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা যে কয়টী পাইয়াছি, তাহাই এস্থানে প্রকাশ করিলাম।